সালাতের শিক্ষা

মাওলানা আহমাদুল্লাহ্

পেশ কালাম

কোরআনুল কারীম আল্লাহ্‌র কালাম। আরবী ভাষায় আল্লাহ্ পাক্ মানুষের হেদায়েতের জন্য নাযিল করেছেন এই কালাম। এর পঠন-পাঠন করে দিয়েছেন সহজ। আল্লাহ্ সূরা কামারে- ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ নাম্বার আয়াতে ৪টি স্থানে উল্লেখ করেছেনঃ

"(আল্লাহর কসম) নিশ্চয়ই আমি এই কুরআনকে (তিলাওয়াত ও বুঝার জন্য) সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর কেউ আছে কি, কোন চিন্তাশীল বা উপদেশ গ্রহণকারী?"

সুতরাং এই কোরআনকে বুঝা এবং হিফ্‌জ করা অতি সহজ করে দিয়েছেন, যেন মানুষ গাফেল না থাকে। সুরা আম্বিয়ার ১০নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

"হে মানুষ! আমি তোমাদের প্রতি এমন একখানি কিতাব নাযিল করেছি যাতে তোমাদেরই উল্লেখ রয়েছে, তোমরা বুঝে দেখছো না কেন?"

মানুষ খাঁটি মুসলমান হয়ে জীবন যাপন করতে হলে কোরআনের কথাগুলো জানতে হবে এবং মানতে হবে। সূরা আল-আনকাবূতের ৪৫নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

"সালাত মানুষকে পাপ, অন্যায় ও অশ্লীলতা এবং লজ্জাশীল কাজ হতে বিরত রাখে।"

কাজেই কোন্‌টি অশ্লীল, অন্যায় ও লজ্জাহীনতার কাজ, তা না জানলে সালাত আদায়কারীরা ঐসব গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকবে কি করে? এসব চিন্তা-ভাবনাকে সামনে রেখেই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

ইবাদতের হক আদায় করার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহ্‌র আইন-বিধানাবলী জেনে নেয়া সালাত আদায়কারীদের জন্য অপরিহার্য। কারণ আল্লাহ্‌র হুকুম আহ্‌কাম না জানলে আমরা অনুসরণ করবো কি করে?

সালাত-ই এই প্রয়োজন পূরণ করে। সালাতের মধ্যে কোরআন শরীফের আয়াত পাঠ করার বিধান এজন্যই দেয়া হয়েছে। আশা করি এই পুস্তিকাখানির কথাগুলো সামনে রেখে জুমু'আর সালাতের পুর্বে ইমাম সাহেব খোতবায় কথাগুলো মুসল্লীদেরকে জানাবেন। জামায়াতের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে এবং সালাতে যা কিছু পড়েন তা মুসল্লীদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করা একান্ত জরুরী। এতে করেই মুসল্লীগণ কোরআনের অনুসারী হবেন, ইসলামের অনুসারী হবেন। এতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কোরআনের অনুশাসন এই মসজিদের দেশে কায়েম করা সম্ভব হবে।

আল্লাহ্ আমাদের এই পুস্তিকা থেকে পাওয়া আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশগুলো পালন করার তওফীক দিন। আমীন॥

আহমাদুল্লাহ্
ঢাকা।

সালাতের শিক্ষা

আল্লাহ্ পাক যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা হলো শুধু আল্লাহর ইবাদত করা।

যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে দুনিয়েতে পাঠিয়েছেন মানুষকে তাঁর দাসত্বের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য। তাঁদের দাওয়াত ছিল, মানুষ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, আর তাগুতের দাসত্ব পরিহার করবে।

আল্লাহর বান্দাদেরকে প্রকৃত অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ্ ইবাদতের যতোগুলো নির্দেশ দিয়েছেন তম্মধ্যে ঈমানের পরেই সালাত। সালামই ঈমানের প্রথম প্রকাশ। ঈমানের সাক্ষ্য দেয়ার পরই যে কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো সালাত। সালাতের ধরনটা একটু লক্ষ্য করুন- আল্লাহু আকবার বলেই সালাতে প্রবেশ করি। যে কালেমাটি আমাদের মুখ দিয়ে বের হয় তা হলো এইঃ

"আমি চতুর্দিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্যান্য সব জিনিষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আনুগত্যের সমস্ত মাধ্যম পরিত্যাগ করে একাগ্রতার সাথে আসমান-জমিন যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিলাম। আর আমি কখনই মুশরিদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

এরপর দোয়া, তাসবীহ আর কেরাতের প্রতি লক্ষ্য করুন। বুকে হাত বেঁধে দৃষ্টি অবনমিত করে আদবের সাথে দাঁড়ানো, কোমর বাঁকা করা, রুকু করা, সেজদা করা, প্রত্যেক অবস্থায়ই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা, দোয়া পড়া, প্রত্যেকটি কাজই আল্লাহর ভয়ে ভয়ে সম্পন্ন করা হয়।

কোরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত যে, সালাত গোটা শরীয়ত অনুসরণের প্রেরণার উৎস এবং রক্ষকও বটে।

"দ্বীনের মস্তক হলো ইসলাম (তাওহীদ এবং রিসালতের স্বীকৃতি) আর স্তম্ভ হলো সালাত।" (তিরমিযী)

যদিও ইসলামের আরও স্তম্ভ রয়েছে, কাজেই এ হাদীস থেকে বলা যেতে পারে যে, সালাত একাই দ্বীনের স্তম্ভ। কাজেই সালাতের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ধ্বংস সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে উদাসীন। এ কারণেই কিছু মানুষ দেখা যায়, এরা সালাত পড়ে কিন্তু তাদের চরিত্রের কোনই পরিবর্তন হয় না।

হযরত উমর (রাঃ) তাঁর অধীন সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে লিখিত নির্দেশ-নামায় বলেছেনঃ

'আমার কাছে তোমাদের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে সালাত সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে ব্যক্তি সালাতের রক্ষণা-বেক্ষণ করলো এবং তার হক পুরোপুরি আদায় করলো, সে তার গোটা দ্বীনের রক্ষণা-বেক্ষণ করলো আর যে ব্যক্তি তার সালাত নষ্ট করলো সে অবশিষ্ট সবকিছুই নষ্ট করে ফেলবে।' (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)

সালাত কিভাবে নষ্ট হয় তার আরও বিবরণ দেখতে পাই আল-কোরআনে সূরা মারইয়ামের ৫৯নং আয়াত।

"অতঃপর তাদের পরে সেইসব অযোগ্য অবাঞ্ছিত লোকেরা যখন তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা সালাতকে নষ্ট করলো আর নাফ্সের লালসা-বাসনার অনুসরণ করল, অচিরেই তারা "গাই" নামক জাহান্নামের গর্তের সম্মুখীন হবে।"

'গাই' শব্দের ব্যাখ্যাঃ সহীহ হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন, *"'গাই' জাহান্নামের একটা গর্ত। এর দাহিকা শক্তি এতো অধিক যে, অন্যান্য দোযখ প্রতিদিন ৭০বার এই গর্ত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়।"*

সালাত কিভাবে বিনষ্ট হয় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আরবী "লিসানুল আরব" অভিধানে- অর্থাৎ মুসল্লিরা আল্লাহ্‌র সাথে সালাত যা ওয়াদা করলো সেই ওয়াদা খেলাফ করলে সালাত বরবাদ হয়ে যাবে। তাফসীরে ইবনে কাছীরে এই আয়াতের প্রসঙ্গে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তম্মধ্যে একটি হাদীস হলো এইঃ *"সালাত হলো আমাদের এবং মুসল্লীদের মধ্যে ওয়াদ, যে সালাতে তেলাওয়াতকৃত এই ওয়াদা ভংগ করবে সে অবশ্যই কুফুরী করে।"* এছাড়া সুরা ফাতেহার মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহর সাথে যে পাকাপাকিভাবে একটি ওয়াদা করতে হয় তার প্রমাণ পাই সহীহ মুসলিমের এই হাদীসের মাধ্যমে- *"আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন বলেন (সূরাতুল ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায় তা তাদেরকে দেয়া হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন যে, যখন বান্দাগণ বলে- "সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নামে"- তখন আল্লাহ্‌ বলেন- "আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করলো। আর যখন বলে- "যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়াল"- তখন আল্লাহ্‌ বলেন- "আমার বান্দা আমার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করেছে। আর যখন বান্দা বলে- "যিনি বিচার দিনের মালিক"- তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- "আমার বান্দাগণ আমার গুণ-গান করছে। আর বান্দা যখন বলে- "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি"- তখন আল্লাহ্‌ রাহমানুর রাহিম বলেন- "এই আয়াতটি আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে সংযুক্ত, কেননা এর এক অংশে আমার প্রশংসা আর অপর অংশে আমার বান্দাদের দোয়া ও আরজ রয়েছে। এর সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তাই তারা পাবে। অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে- "আমাদের সরল পথ দেখাও"- থেকে শেষ পর্যন্ত। তখন আল্লাহ্‌ বলেন- "এসবই আমার বান্দাদের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা পাবে।"*

এই হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম সূরা ফাতিহা কেন বার বার সালাতে তিলাওয়াত করতে হয়। এই সূরা তেলওয়াত ব্যতীত সালাতই হবে না।

এই সূরার অনেক গুলো নামের মধ্যে একটি নাম হলো (সাব'য়ু মাসানি) বার বার পাঠ করার ৭টি আয়াত। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে এই সূরাটি একটা শপথনামা, এই শপথ নামার মাধ্যমে আমরা যে সিরাতুল মুস্তাকীম চাইলাম সে কথাই আল্লাহ পাক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন "আর তোমরা আমারই ইবাদত করবে। আনুগত্য করবে আমার বান্দা হিসাবে।" আর এই কোরআনই হচ্ছে সিরাতুম মুস্তাকীম।

আমাদের কাম্য হিদায়াত সম্পর্কে আল্লাহ পাক সূরা বাকারার শুরুতে বলেছেন, *"এই কিতাবটি মুত্তাকীনদের জন্য হিদায়াত।"* আমরা সূরা ফাতেহার মাধ্যমে যে ইবাদতের কথা ওয়াদা করি সেই "ইবাদতের" কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাক এক আয়াতে আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন *"হে মানুষ তোমরা তোমাদের সেই রবের দাসত্ব কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল লোকেরই সৃষ্টিকর্তা।"* (সূরা আল বাকারা : ২১)

এখানেই নিহিত রয়েছে তোমাদের আত্মরক্ষার উপায়। এখানেও যেন সূরা ফাতেহার ইবাদতের জাওয়াবই দেয়া হচ্ছে। সূরা ফাতেহার পর এই আয়াত তিলাওয়াত করার তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেহেতু আল্লাহ আমাদের রব, লালন-পালনকারী, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর হুকুমই পালন করতে হবে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ *"সাবধান সৃষ্টি যার হুকুম তারই চলবে।"* (সূরা আরাফঃ ৫৩)

আমাদের নবী (সাঃ) এর মাধ্যমে যে হিদায়াত পেয়েছি সেটিই হলো প্রকৃত হিদায়াত। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে আল্লাহ পাক যে হিদায়াত দান করেছেন সেই হিদায়াত আমাদের কাম্য। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে আল্লাহ পাক যে হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তাহলো দ্বীনে হক্ব। আর এই হিদায়াতের উদ্দেশ্য হলো বাতিলকে হটিয়ে দ্বীনে হক্বকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

আর সূরা ফাতোহার মাধ্যমে আমরা এই দোয়াও করি,

"হে আল্লাহ তুমি আমাদের পূর্ববতী লোকদের (যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছো সেই নিয়ামত প্রাপ্ত লোক) পথে আমাদেরকে পরিচালিত কর।"

আল্লাহ পাক যেন সেই জওয়াবই দিয়েছেন সর্বশেষ আয়াত নাযিল করে,

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে কবুল করে নিয়েছি।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৩)

এই আয়াতে আল্লাহ পাক দ্বীনের কথা উল্লেখ করে নিয়ামতের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

সর্বশেষ যে দোয়াটি আমরা করি *(তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট)* সূরা ফাতেহার ৪নং আয়াতে আল্লাহর কাছে আমরা (সিরাত্বল মুস্তাকীম) চাই, আর সর্বশেষ আয়াতে গজবওয়ালা জাতি ও পথ ভ্রষ্ট জাতি যা তাফসীরে ইহুদীদের পথ আর নাছারাদের পথে নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সারা দিন কমপক্ষে ৩২ বার (অর্থাৎ ফরজ ১৭ রাকায়াত সুন্নাত ১২ রাকায়াত এবং বেতের ৩ রাকায়াতে) আমরা নামাজে এ ওয়াদা করছি, অথচ গজবের জাতি ইহুদী ও পথভ্রষ্ট জাতি নাছারাদের পথেই চলছি অর্থাৎ তাদেরই সংবিধান অনুযায়ী চলছি এবং ইহুদী নাছারাদের পথেই আমরা মুসলমানরা পরিচালিত হচ্ছি। বড়ই লজ্জার কথা, সারা জীবন আল্লাহর পথে চলার আয়াতগুলোও তিলাওয়াত করে, দৈনিক ৩২ বার ওয়াদাও করি, কিন্তু ইহুদী ও নাসারাদের পথেই চলছি। এ কথাগুলো ইমাম সাহেবগণ নিজেরাও বুঝবার চেষ্টা করেন না- আর মুসল্লীদেরকেও বুঝাবার চেষ্টা করেন না। একবার উক্ত ওয়াদা করার পর যদি ওয়াদা পূরণের চেষ্টা না করা হয় তাহলে আল্লাহর ফেরেশতাগণ- *"তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে"*- তেলাওয়াতের সাথে সাথেই কি এই কথা বলবেন না যে, "হে মিথ্যাবাদীর দল, তোদের দল, তোদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক?

এই কারণেই ওয়াদানুযায়ী আমল না করলে সালাত বরবাদ হয়ে যায় আর অচিরেই 'গাই' নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে বলে আল্লাহ্ বলেছেন। আর দুনিয়াতেও তো আমরা প্রভাব প্রতিপত্তিহীন হয়ে পড়েছি। এই সালাত আদায়কারীদের কোন প্রভাবই তো নেই। এ ধরনের সালাত আদায়কারীদের মানুষও ঘৃণার চোখে দেখে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে, সালাতে যা তেলাওয়াত করি তার অর্থ জানাও যে জরুরী একথা আমরা ভুলেই বসেছি। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় সালাতের কাছেও যাবে না, এমনকি তোমরা যা বলছো তা যেন সঠিকভাবে জানতে পার (তখন সালাত পড়বে)।" (সূরা নিসাঃ ৪৩)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সালাতে যা আমরা 'বলছি' বলেছেন 'পড়ছি' বলেননি। পড়া আর বলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে আকাশ পাতাল। পড়লে করা না করার ইখতেয়ার আছে আর বললে করতেই হয়। যেমন- আল্লাহ্ বলেন,

"হে মুমিনগণ! এমন কথা কেন বলছো যা করছো না, এতে আল্লাহ ক্রোধের উদ্রেক হয়, তোমরা যা বলবে অথচ তা করবে না।" (সূরা ছফঃ ২,৩)

উপরে উল্লেখিত সূরা নিসার ৪৩নং আয়াতের প্রথম অংশে মাতাল অবস্থায় সালাত যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কুফার গভর্ণর অলীদ ইবনে ওক্বা একদিন ফজরের সালাত ২ রাকায়াতের স্থলে ৪ রাকায়াত পড়ালেন আর বললেন- "আরো পড়াবো নাকি? মুসল্লীদের সন্দেহ হলো। বিচার গেল হযরত উসমান (রাঃ) আদালতে। তদন্ত করে জানলেন যে তিনি মদ খেয়ে সালাত পড়াতে এসেছিলেন। প্রমাণিত হওয়ার পর শাস্তি দেয়া হলো। আর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে- *"এমনকি তোমরা যা বলছো সে সম্পর্কে তোমাদের ইল্‌ম থাকতে হবে।"* একথার তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেছেন যে, লোকটি সালাতে আল্লাহর সাথে যে ওয়াদাটাই করলো যদি সে ওয়াদার কথা নাই জানালো তাহলে ওয়াদা পুরা করবে কি করে? কাজেই এই লোকটি মদখোরের চেয়েও বেশী অপরাধী।

"আমার স্মরণের জন্য সালাত কায়েম কর।" (সূরা ত্ব-হাঃ ১৪)

"সেজদা কর এবং নিকটবর্তী হও।" (সূরা-আলাক)

"বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় তখন, যখন সে সেজদায় যায়।" (মুসলিম)

"অবশ্যই তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সালাত আদায় করে, তখন সে তার প্রভুর সাথে কথা বলে।" (বুখারী)

"আর সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাতে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আল আনকাবূতঃ ৪৫)

এখানে অশ্লীল ও খারাপ কাজ কোনটি, অর্থ না জানলে বিরত থাকব কি করে? আয়াতের শুরুতে সালাত কায়েমের কথা বলা হয়েছে। আর কায়েমের ব্যাখ্যা করলেই বুঝা যায় যে অর্থ জানতে হবে। আর অর্থ না জানলে সালাত কায়েম করবেন কি করে?

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'কায়েম বা ইকামত'- এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে অর্থাৎ কোন একটা জিনিষকে কায়েম করা মানে তার যা হক রয়েছে তা পুরাপুরিভাবে আদায় করা। যেমন : আল্লাহ বলেন,

"হে আহলে কিতাব তোমাদের কোনই মূল্য নেই যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত এবং ইঞ্জিল কায়েম করবে।"(সূরা মায়েদাঃ ৬৭)

অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল কায়েম করতে হলে তা জানতে হবে এবং আমল করতে হবে। তবেই তাওরাত ও ইঞ্জিল কায়েম হবে।

আর এখানে সালাত কায়েমের কথা বলা হয়েছে কাজেই সালাতে যা আমরা কোরআন থেকে তেলাওয়াত করি তার অর্থ জানতে হবে এবং তা আমল করতে হবে। পূর্ববর্তী লোকেরা যেই সালাতে যা তেলাওয়াত করতো সে অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার নির্দেশ দিতো। একথা আমরা আরও একটি আয়াতের মাধ্যমে পাই।

তা হলো এই, *"তারা বললো, হে শুয়াইব! আপনার সালাত কি আপনাকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা ত্যাগ করি ঐসব উপাস্যকে যাদের উপাসনা করে আসছে আমাদের বাপ-দাদারা অথবা আমাদের সম্পদে আমরা ইচ্ছা মতো যা কিছু করে থাকি তা ত্যাগ করি? নিশ্চয়ই আপনি তো একজন বুদ্ধিমান, ভালো মানুষ।"* (সূরা হুদঃ ৮৭)

এ আয়াতের পূর্বের আয়াতগুলোতে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ রয়েছে আর পরিমাপে কম না দেয়ার হুকুম রয়েছে, আর জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি না করার কথা বলা হয়েছে। (যেহেতু সালাতে) আসমানী কিতাবের আয়াত তেলাওয়াত করে শপথ নেয়া হয় যে, এসব করবে আর এসব করবে না। কাজেই শোয়াইব (আঃ) যখন সালাতে শপথ নেয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, দেখ সালাতে যা তিলাওয়াত কর আর কাজে তার বিপরীত, এটা মুমিনের জন্য শোভনীয় হতে পারে না। তখন জাতি এর জবাবে বলেছেন, হে শুয়াইব (আঃ), তোমার সালাতে কি তোমাকে এই হুকুম করেছে যে, আমরা ঐ সব মাবুদের পরিত্যাগ করব, যাদের আনুগত্য আমাদের বাপদাদারা করত? আর এই যে আমাদের মাল সম্পদ, তা আমাদের ইচ্ছামত ব্যয় করার অধিকার থাকবে না? শুধু তুমিই একজন সদাচারী ব্যক্তি থেকে গেলে? অর্থাৎ সালাত তেলাওয়াত করলাম দেখেই তা- ই করতে হবে?

এই কথা দ্বারাই বুঝা যায়, সমাজ পরিচালনার শপথ সালাতের মাধ্যমেই করা হতো যুগে যুগে। কাজেই যখন এই নীতি বর্জিত হলো আর একদিকে পরবর্তী লোকেরা এই রীতি বর্জন করে শুধু সালাত আদায়কারী হলো, অপরদিকে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে চললো, এমতাবস্থায় জাতি উপর নেমে এলো চরম অধঃপতন।

প্রতিটি ইবাদতে ইনসাফ, সত্যতা ও সততার হুকুম দিয়ে আল্লাহ বলেছেন যে,
"আপনি বলে দিনঃ আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় মুখমন্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃজিত হবে।"
(সূরা আল আরাফঃ ২৯)

এখানে প্রত্যেক আত্মসমর্পণের জায়গায় অর্থাৎ আমরা মসজিদে সালাত আদায় করি, আর সালাতের নামে নাম না হয়ে মসজিদ হয়েছে সিজদার জায়গা। কাজেই সমাজের প্রত্যেকটি কাজ কুরআনের আয়াতের আলোতে আঞ্জাম দেয়ার শপথ সালাতে করা হয়। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয়

জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন মোটকথা প্রত্যেকটি কথাই অঙ্গীকার করা হয় সালাতে। কোন অপরাধের কি শাস্তি হলে সে অপরাধ দমন সম্ভব হবে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে এই কোরআানের আয়াতসমূহে।

"আমি এই কোরআনে তাদের প্রতি ফরয করে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমসমূহের বিনিময়ে সমান যখম।" (সূরা মায়েদাঃ ৪৫)

"*যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং দেশে হাঙ্গামা আর সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হস্ত পদসমূহ বিপরীত দিক হতে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ হতে বহিষ্কার করা হবে, এটি হলো তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনার শাস্তি আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"* (সূরা আল মায়েদাঃ ৩৩)

"*যে পুরুষ চুরি কম করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃত কর্মের সাজা হিসাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী, আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়।"* (সূরা আল মায়েদাঃ ৩৮)

"*যারা মাপে কম করে তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা লোকের কাছে থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়, আর যখন লোকদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়।"* (সূরা মুতাফফেফীন)

"পেছনে পেছনে ও সামনে প্রত্যেক পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ।" (সূরা হুমাযাহ)

"(হে নবী) তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে যে পরকাল অস্বীকার করে, সে তো এ কারণেই ইয়াতীমকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।" (সূরা মাউন)

একথা গুলো মুসল্লিগণ জানলে অবশ্যই সমাজ সংশোধন হতে বাধ্য।

"অপরদিকে আরও অধিকার নেই যে, আল্লাহর মসজিতসমূহ আবাদ করবে এমতাবস্থায় যে নিজেরাই কুফরীতে নিমজ্জিত। এদের সমস্ত আমলই বরবাদ হবে এবং স্থায়ীভাবে দোযভের আগুনে বসবাস করবে।"

এ আয়াতে তা'মীরে মসজিদের কথা বলা হয়েছে। আরবের লোকেরা তিনটি অর্থেই তা'মীরে মসজিদ ব্যবহার করতো।

১) মসজিদ তৈরী করা।
২) মসজিদ পবিত্র রাখা।
৩) মসজিদে ইবাদত করা।

কাজেই এখানে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, একদিকে আল্লাহর মসজিদে ইবাদত করবে, অপরদিকে শিরক ও কুফরের সাক্ষী হবে, এমতাবস্থায় এই ধরনেই লোকদের আল্লাহর মসজিদে ইবাদত করার অধিকার নেই। আর মসজিদে গিয়ে যতো ইবাদতই করুক, সব ইবাদতই বিনষ্ট হবে, বরবাদ হবে, আর অনবরত দোযখের আগুনে জ্বলবে।

আসুন "শাহেদীনা" কে নিয়ে একটু চিন্তা করি। প্রকৃতপক্ষে আমরা শিরক ও কুফরের সাক্ষী হচ্ছি কিনা। আর আমাদেরকে যে আল্লাহ পাক সাক্ষী নিয়োগ করেছেন, তার প্রমাণ এই আয়াতে রয়েছে।

"আর এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যম পন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও।" (সূরা বাকারাঃ ১৪৩)

আমরা সমাজের কিছু লোক শিরক ও কুফরী না করলেও মানবমন্ডলীর মধ্যে যে শিরক ও কুফরী চলছে, তার সাক্ষী তো হচ্ছি। ইসলামীক বিধান কায়েম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি না, সাক্ষ্য দেয়ার ব্যবস্থা করছি না, অথচ মসজিদে দৈনিক পাঁচ বার শিরক করবো না বলে ওয়াদা করি।

নিশ্চয়ই আমি একাগ্রচিত্তে শুধু তাঁরই দিকে আমার মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান জমিন, আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।" (আল আনআমঃ ৭৯)

এই আয়াত তেলাওয়াত করে আমরা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করি। যে ঘোষণাটি ইবরাহীম (আ) দিয়েছিলেন, সেই ঘোষণা আমরাও দেই। আর একবার রাত্রে ঘুমাবার আগে বেতের সালাতে দোয়ায়ে কুনূত তেলাওয়াত করে ওয়াদা করি, *"ওয়া নাসকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা"* অর্থাৎ *"আমরা তোমার শোকর আদায় করছি আর কখনো তোমার কুফরী করবো না।"* সবসময় মসজিদে উপস্থিত হয়ে এই ওয়াদা করে যাচ্ছি অথচ শিরক ও কুফর থেকে মসজিদের বাইরের জগতকে মুক্ত করার চেষ্টা করি না, এমতাবস্থায় আমাদের এই দোয়াগুলো পড়ার কি মূল্য থাকতে পারে?

কোন মামলার সাক্ষী যদি সাক্ষ্য না দেয়, সাক্ষীর অভাবে মামলা ডিসমিস হতে বাধ্য। কাজেই আল্লাহর নিয়োগকৃত সাক্ষী হয়ে সাক্ষ্য না দেয়ার কারণে শিরক ও কুফরও দূর হচ্ছে না। আামাদের মামলার সাক্ষী যদি সাক্ষ্য না দেয় তাহলে আমরা বলি জালেম, আর আল্লাহর পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়ার কারণে আল্লাহ বলেন আমাদেরকে বড় জালেম।

"আর তার চাইতে বড় অত্যাচারী কে হতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিকট কোন প্রমাণ বর্তমান রয়েছে, অথচ সে ইহা গোপন করে। জেনে রাখ আল্লাহ তোমাদের এহেন আচরণ সম্পর্কে মোটেই গাফেল নন।" (সূরা বাকারাঃ ১৪১)

এবার চিন্তা করুন আল্লাহর মসজিদে গিয়ে আমরা কি কি ওয়াদা করি আর ওয়াদা মোতাবেক কাজ কতটুকু করি।

আল্লামা ইকবাল বলেছেনঃ

"দুনিয়ার সমস্ত পাপ পংলিকতায় লিপ্ত রয়েছি আর যমযমের কূয়ায় গোসল করছি,
পানি শরীরটা পাক করলো বটে কিন্তু দিল পাক করবে কে?"

কাজেই এবার একটু চিন্তা করুন আল্লাহ পাক সমাজকে শিরক ও কুফর মুক্ত করার জন্য কি গুরুত্বপূর্ণ কথাইনা বলেছেন।

মসজিদের খাদেমের গুণাবলী

সূরা তওবার ১৮নং আয়াতে কারা এবং কোন্ কোন্ গুণ বিশিষ্ট লোকেরা আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে, তাদের গুণের কথা বলা হয়েছে,
"নিঃসন্দেহে (কেবল মাত্র) আল্লাহর মসজিদ আবাদকারী তারাই হতে পারে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, আর পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন্ করেছে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। কাজেই আশা করা যায়, এরাই প্রকৃতপক্ষে হেদায়াতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এরাই সোজা ও সঠিক পথের অনুসারি।"

এ আয়াতে আল্লাহর মসজিদসমূহে ইবাদতকারী, আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদকারী কারা হবেন, তাদের ৫টি গুণের কথা বলা হয়েছে। এই পাঁচটি গুণের মধ্যে একটি গুণ কম হলেও চলবে না, কারণ এটা আল্লাহর নির্দেশ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ৫টি গুণের একটি গুণও মসজিদ আবাদকারী (মুসল্লিদের) মধ্যে পাওয়া যাবে না।

১নং গুণ হলো- 'মান আমানা বিল্লাহি'-অর্থাৎ 'যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে'।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার তো তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণকালে কেঁপে ওঠে, আর আল্লাহর আয়াতসমূহ যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর তারা তাদের আল্লাহর উপর ভরসা রাখে।"

এই আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কত কিছু জমিনে চলছে। অথচ আল্লাহকেও স্মরণ করি, আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করি, কই আমাদের অন্তরও কাঁপে না, ঈমানও বৃদ্ধি পায় না। কারণ আল্লাহর উপর ভরসা নেই।

ঈমানের জন্য শর্তঃ

১) অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে,
২) মুখে স্বীকার করতে হবে,
৩) কাজে পরিণত করতে হবে।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। এখন বলুন এই তিনটি গুন এক সাথে আমাদের মাঝে আছে কিনা।

ঈমানের আরেকটি কলেমাও আমরা পড়ে থাকি, তাহলোঃ
"আমি আল্লাহর নামসমূহ, গুণাবলীসমূহের উপর ঈমান আনলাম এবং আল্লাহর যাবতীয় হুকুম ও মুলনীতি কবুল করে নিলাম।"

কাজেই আমরা দুনিয়ার প্রায় দেড় শত কোটি মুসলমান, আল্লাহর যাবতীয় হুকুম ও মূলনীতি কবুল করে নেয়ার কলেমা মুখে উচ্চারণ করে থাকি আর কাজ করি তার বিপরীত। এমতাবস্থায় আমরা মুমিন থাকি কি করে?

আল্লাহর কালামের কিছু মানবো আর কিছু মানবো না, একথা কোন মুমেনের জন্য শোভনীয় হতে পারে না। এরুপ আচরণ যে কুফরী এতে কোনই সন্দেহ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"তোমরা কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছো আর কিছু অংশ অমান্য করে চলেছো অর্থাৎ কুফরী করে চলেছো। যারা এরুপ আচারণ করে, তাদের দুনিয়ার জীবন হবে লাঞ্ছিত ও পদদলিত আর কিয়ামতের দিন কঠিন আযাবের দিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সূরা বাকরাঃ ৮৫)

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর জাতের কছম করে বলেছেনঃ *"(হে নবী) তোমার রবের জাতের শপথ করে বলছি, তারা কখনো মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত তুমি তাদের মধ্যে যে ফায়সালা করে দিয়েছো, সে অনুযায়ী তারা বিচার ফায়সালা না করে। এমনকি তাদের মনে এ ব্যাপারে একটুও দ্বিধা সংকোচ আনতে পারবে না। আর যে পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে শিরধার্য করে মেনে না নেয়।"* (সূরা নিসাঃ ৬৫)

আবার কিছু মোমেন সহজ দ্বীনদারীকে গ্রহণ করেছে এবং নাজাতেরও আকাংখা রাখে। এ ব্যাপারেও আল্লাহ্ পাক সতর্ক করে ইরশাদ করেনঃ

"হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণা করাকে ঐ ব্যক্তির আমলের সমান মনে করে নিয়েছো যে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে আর পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে। আল্লাহর নিকট এই দু'ব্যক্তি সমান নয়, আর আল্লাহ্ জালেমদেরকে হেদায়াত দান করেন না। যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে (অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে,) এদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট অতি উর্ধ্বে এবং একমাত্র এরাই সফল কাম হবে।" (সূরা তওবাঃ ১৯-২০)

এ আয়াতে প্রকৃত মুমিনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে সামান্য অলসতাও সহ্য করেন না।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।
যদি তোমরা বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"(সূরা তাওবাঃ ৩৮-৩৯)

এই আয়াত হতে আমরা কি শিক্ষা পেলাম? ঈমানদারদের পরিবর্তে শাসন ক্ষমতা আজ ভিন্ন কাওমের হাতে। ঈমানদারগণ সহজ দ্বীনদারী গ্রহণ করে থাকার কারণেই বেঈমানদের হাতে ক্ষমতা যাচ্ছে আর তাদের হাতে মুসলমানরা মার খাচ্ছে। আমরা মুমেন হওয়ার যতো দাবীই করি না কেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে আমরা ধোকা দিচ্ছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

"আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।"(সূরা বাকারাঃ ৮-৯)

আবার কিছু মুমেন মনে করেন যে বিনা বাধায় আল্লাহ্ আমাদেরকে হুকুমত দেবেন, অথচ আল্লাহ্ বলেন বিনা বাধায় বিনা টক্করে হক্ব কায়েম হতে পারে না।

ইরশাদ হচ্ছেঃ
"বরং আমিতো বাতিলের উপর সত্যের আঘাত হেনে থাকি, যা বাতিলের মাথা চূর্ণ করে দেয় এবং তা দেখতে দেখতেই বিলীত হয়ে যায়। আর তোমাদের ভাগ্যে ধ্বংস অবধারিত সেইসব কারণে যা তোমরা রচনা করেছো।"

যে হক্ব বাতিলের উপর আঘাত হানে না, হক্ব এর দাওয়াতে বাতিল টের পায় না, শরীরকে বাচিঁয়ে আল্লাহর ইবাদত করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে। যখন কোন কল্যাণ দেখে তখন নিশ্চিত হয়ে যায় আর যখনই কোন বিপদ দেখা দেয় অমনি পেছনে সরে দাঁড়ায়। এরা দুনিয়াও বরবাদ করলো আর পরকালও বরবাদ করলো। ইহাতো সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসান।"

আমরা ইমাম সাহেবগণ স্বঘোষিত ইমাম, আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইমাম নিযুক্ত করেননি। ইমামতির যোগ্য কারা এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে ইরশাদ করেনঃ

"স্মরণ কর যখন ইবরাহীম (আঃ) কে তাঁর রব বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়েছিলেন এবং সব কয়টিতেই উত্তীর্ণ হলেন, তখন (আল্লাহ) বললেন, আমি তোমাকে সকল মানুষের নিযুক্ত করতে চাই। ইবরাহীম বললেন, আমার বংশধরদের ব্যাপারেও কি এই ওয়াদা? আল্লাহ পাক উত্তরে বললেন, আমার এই ওয়াদা জালেমদের ব্যাপারে নহে।"

ঈমানদারদের কাজ হবে তথা ইমামদের কাজ হবে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ (আমরু বিলমারুফি ওয়া নাহহিইউ আনিলমুনকারি)। তা না করে ইমাম সাহেবান (আরধু বিলমারুফি) অনুরোধ বিল মারুফ ও অনুরোধ বিল মুনাকার করে যাচ্ছেন। এটা আল্লাহ পাক কখনো গ্রহণ করবেন না।

মোটকথা, ঈমান সম্পর্কে কোরআনে কারীমে হাজারো আয়াত রয়েছে। আয়াতগুলোর সাথে আমাদের চরিত্রকে মিলাতে না পারলে আর আমরা ঈমানদরদের মধ্যে শামিল হতে পারবো না।

দ্বিতীয় গুণ হলো- 'ওয়াল ইয়াওমিল আখিরী'- অর্থাৎ 'মসজিদ আবাদ করার জন্য পরকালের প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে'।

যদি আমাদের পরকালে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহির ভয় থাকতো, তাহলে দুনিয়াতে ইসলামের অনুসারীদের এ অবস্থা হতো না। আর লাঞ্ছিতও হতো না।

তৃতীয় গুণ হলো- 'ওয়া আক্বমাসছলাত'- অর্থাৎ 'সালাত কায়েম করা'।

সালাত কায়েম করতে বলা হয়েছে, শুধু পড়তে বলেননি। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "সালাত হলো দ্বীনের খুঁটি। দ্বীন বলতে বুঝায় পরিপূর্ণ জীবন বিধান। সালাত এমন একটা খুঁটি, যেখানে আমরা কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করি, এতে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে ইসলামের সামগ্রিক সম্পর্কে তিলাওয়াত করা হয়। আর এই তিলাওয়াতের অর্থই হলো আল্লাহর সাথে ইকরার করা (ওয়াদা করা)। আর এই ওয়াদা মোতাবেক কাজ না করলে সালাত হবে না। অযথা আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক করা ছাড়া এ ধরনের সালাত হবে না। কারণ সালাত নামক খুঁটির মাধ্যমে আমরা ইসলামের সর্ববিষয়ে জানতে পারি। আর তেলাওয়াত করে ইমাম সাহেবান মুসুল্লিদেরকে শুনান, আর প্রত্যেক রাকাআতে কোরআনের কথাগুলো মানার জন্য রুকু এবং সিজদা করার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে রাকায়াত শেষ করি।

কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করার পর আরও কোরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে যখন রুকুতে যাই তখন রাসূল (সাঃ) এর শেখানো তাছবীহ যা (ফাছাববিহ বিইস্‌মী রববিকাল আজীম) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে (সুববাহানা রববিইয়াল আজীম) মহা পবিত্র আমার রব বা পরিচালক, যিনি সর্বশেষ্ঠ। কারণ (আযীম) শব্দটিতে আলিফ লাম যোগ করার কারণে (মা'আরিফাহ) বা ডেফেনিট এর অর্থ বুঝায়। তার মানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো পরিচালনা গ্রহণ করবো না, কেবল আল্লাহরই রবুবিয়তের অধীন চলবো। কেবল তিনিই আমার পরিচারক বলে স্বীকার করলাম। এরপর কয়েক বার এই শপথ বাক্য উচ্চারণ করার পর ইমাম সাহেব (সামিআল্লাহুলিমান হামেদাহ) বলে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ান, আমরাও সবাই একথা শুনেই দাঁড়াই। তখন সব মুসলমানরাই বলে উঠেন (রববানা লাকাল হামদু) "হে আমাদের রব একমাত্র তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।" এরপরেই আমরা সমস্ত শরীরকে এলিয়ে দিয়ে দুই হাত, দুই পা, দুই হাটু, কপালসহ এইসব অংগ প্রত্যঙ্গ মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে (সুবহানা রববিইয়াল

আ্লা) বলার মাধ্যমে একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ রব এর কাছে মাথা নত করে আমাদের গোটা শরীরকে আল্লাহর নির্দেশের অধীন পরিচালিত করব বলে স্বীকারোক্তি করি। সিজদার নামেই মসজিদ নামকরণ করা হয়েছে। মাসজিদ মানেই আত্মসমর্পণের জায়গা। এখানেও তাসবীহটি নেয়া হয়েছে (সাববিহিসমা রববিকাল আ্লা) এই সূরার প্রথম আয়াত হতে তাসবীহ পড়ে থাকি। (সুবহানা রববিইয়াল আলা) এইভাবে গোটা সালাতটাই হলো একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। মসজিদ থেকে বের হয়ে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী আমাদের গোটা জীবনটাই পরিচালনা করব, এই বলে সালাতে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি। দৈনিক পাঁচ বার প্রতিজ্ঞা করি, আবার সাথে সাথেই প্রতিজ্ঞা ভংগ করি। প্রতিদিন পাঁচ বার আল্লাহর সাথ এরুপ আচরণ করে যাচ্ছি।

পৌত্তলিকরাও তো তাদের দেবতাদের কাছে প্রতিদিন গুনাহ মাফ চায়। বছবে একবার একমাত্র দেবতাকে নদীতে ডুবায়ে বিসর্জন দেয়। আর মুসলমানেরা তাদের রবকে প্রতিদিন পাঁচ বার বিসর্জন দেয়, রববের সাথে ওয়াদা খেলাফ করে (ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি আবার কুফরী করলাম আবার ঈমান আনলাম আবার কুফরী করলাম আবার ঈমান আনলাম আবার কুফরী করলাম এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে সারা জীবন করতেই থাকলাম এবং এতে মনে কোন অনুসচনাও নেই।) কথা গুলো বুঝিয়ে দেয়া ইমাম ছাহেবের দায়িত্ব। কারণ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক ইমাম সাহেবদেরকে আগে ডাকবেন। আর ইমামদের কাছ থেকে হিসাব নেবেন, তাঁরা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন কিনা। কাজেই দেখা যাচ্ছে ইমাম সাহেবও সঠিকভাবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছেন না। আর সালাতীরাও সালাত আদায়কারীকে না বুঝার কারণে সালাত বরবাদ করে যাচ্ছেন।

মসজিদ আবাদকারীদের যে পাঁচটি গুণের কথা উক্ত আয়াতে বলা হলো তন্মধ্যে সর্বশেষ গুনাটি হলো- 'ওয়ালাম ইয়াখ্শা ইল্লাল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না'।

এ গুণটি ইমামসহ সকল মুসল্লীদের মধ্যে অনুপস্থিত। তবে ইমাম সাহেবদের অবস্থা হলো "ওয়া লাম ইয়াখ্শা ইল্লা মসজিদ কমিটি।" এছাড়া ইমাম সাহেবান যেন শিশু শ্রেণীর একটা ছড়ার উপরই আমল করে যাচ্ছেন, তাহলো এইঃ

বাবু রাম সাপুড়ে
কোথা যাস বাপুরে,
আয় বাবা দেখে যা
দুটো সাপ দেখে যা,
যে সাপের চোখ নেই, মুখ নেই, শিং নেই,

ছুটে নাকো হাটে না,
কাউকে সে কাটে না।
করে নাকো ফোঁস্ ফাঁস্,
মারে নাকো ঢাস,
নেই কোন উৎপাত,
খায় শুধু দুধ ভাত।
সেই সাপ জ্যান্ত,
গোটা দুই আনতো?
তেড়ে মেরে ডান্ডা,
করে দিব ঠান্ডা।

উপরের উদাহরণটা একটু লক্ষ্য করুন, আর একটু চিন্তা করুন, ইমাম সাহেবানদের অবস্থাটাও যেন ঐরূপ। কোন উৎপাত করেন না, শুধু দুধ ভাত খান। ইক্বামতে দ্বীনের কথা বললে চাকরী হারানোর ভয় থাকে। আর এ কারণেই দায় সারা গোছের কথাবার্তা বলেন। কমিটিকে খুশী রাখার জন্য যতো চেষ্টা তদবীর সবই করেন। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন কিভাবে কায়েম হবে, আমাদের প্রিয় নবী রাসূল (সাঃ) কিভাবে দ্বীন কায়েম করেছিলেন সে ব্যাপারে কোন চিন্তা ফিকির করেন না।

মক্কী জীবনের ১৩ বছর আর মাদানী জীবনের ১০ বছর এই ২৩ বছরে তিনি যে পূর্ণাংগ ইসলাম কায়েম করেছিলেন- আমাদেরকেও সেই কাজই করতে হবে। এই কথাগুলো ইমাম সাহেবানদের বলার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বলেন না। তাহলে রাসূল (সাঃ) এর ইত্তেবা কি করে হলো? কারণ তিনিইতো হলেন আমাদের আদর্শ নেতা।

যারা আল্লাহর দীদার লাভ করতে চায় তারা যেন রাসূল (সাঃ) কে উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে।

আর আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে রাসুলের অনুসরণ জরুরী, একথাও আল্লাহর পাক ঘোষণা করেছেনঃ

"হে নবী আপনি জানিয়ে দিন যারা আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে চায় তারা যেন আপনার ইত্তেরা 'অনুসরণ' করে।"

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাহলো এই যে, সালাতে উপস্থিত করার জন্য আযানের যে শব্দগুলো উচ্চারণ করা হয়। মুয়াজ্জিন যে কথাগুলো বসে মুসল্লিদেরকে ডেকে আনেন, ঐ কথাগুলো উচ্চারণের সাথে সাথে আমাদের যে দোয়াটি করা সুন্নাত।

এরপর পরই আমরা যে দোয়াটি পড়ি তাহলো এই- "আয় আল্লাহ এই যে পরিপূর্ণ আহ্বান আর সালাত কায়েমের ডাক।"

আযানের বাক্যগুলো একটা পরিপূর্ণ দাওয়াত, এই শব্দগুলো উচ্চারণ করে আমরা যে ওয়াদাটি করি, মুয়াজ্জিনের কথায় আমরা সবাই সাড়া দেই এর তাৎপর্য কি?

আযান শব্দটি উজনুন এর বহুবচন, উজনুন মানে কান, আযান অর্থ অনেক কান। অনেকগুলো কানে যে শব্দগুলো শুনানো হচ্ছে- "আমরা এটাকে পাবলিসিটি (প্রচারণা) বলতে পারি।"

দৈনিক ৫ বার ঘোষণা হচ্ছে। এই ঘোষণা আর ৫ ওয়াক্ত সালাতের কি মর্ম তা কি আমরা বুঝলাম?

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কম্যুনিজম কায়েম হয়, কিন্তু মুসলমানরা কম্যুনিজমের সাথে নিজেদেরকে মিশিয়ে নিতে পানেনি। কেন পারেননি?

এই নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে তারা বুঝতে পারলো যে, এর জন্য দায়ী হচ্ছে মসজিদ তখন জনৈক নাস্তিক মন্তব্য করলো যে, যদি লোকেরা আমার কাছে দৈনিক ৫ বার হাজির হয়, তাহলে গোটা দুনিয়াকে আমি কম্যুনিস্ট বানিয়ে নিতে পারবো, (দৈনিক ওজাক, জেদ্দ, ১৯৯০ই)। দৈনিক ৫ বার আল্লাহর দরবারে হাজির হবার এবং আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী চলার ওয়াদা দিচ্ছি। এরকম সুযোগ দুনিয়ার কোন জাতির মধ্যে নেই। তবু আমাদের এই অধঃপতনের কারণ কি? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা মসজিদে "সালাত" কায়েম করতে যাই না, আমরা যাই শুধু সালাত পড়তে।

সালাত 'নম' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'নম' অর্থ হলো নমস্কার। যেভাবে হিন্দুরা তাদের দেবতা মূর্তিকে মন্দিরে গিয়ে নমস্কার করে এবং মনে করে দেবতা গুনাহ মাফ করে দেয়। প্রতিদিন তারা এভাবে নমস্কার করে আর নমস্কার পাবার জন্যই তাদের এই দেবতা। তারা এইভাবে এক বছর পর তারা নির্ধারিত দিনে তাদের এই দেবতাকে নদীতে বিসর্জন দেয়, আবার নতুন দেবতা বানায়।

তারা এক বছর পর বিসর্জন দেয়, অপরদিকে মুসলমানগণ তাদের আল্লাহকে প্রতিদিন ৫বার বিসর্জন দিয়ে থাকে। (নাউজুবিল্লাহ্)

তার অর্থ হলো এই যে আমরা আমাদের আল্লাহর হুকুমানুযায়ী সালাত পড়ার জন্যই শুধু মসজিদে যাই, সালাত অর্থাৎ নমস্কার করাটাই আমরা ইবাদত মনে করি। জীবনের অন্যান্য দিকগুলো পরিচালিত করার জন্য যতো ওয়াদাই করি না কেন তা আমরা ওয়াদা মনে করি না। নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে চলি; অথচ আমরা একটু ভেবে দেখি না যে, আমাদের

জীবনের সর্বস্তরে- আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এই সালাত। আর এই সালাতই হলো প্রতি দিনকার পাঁচ বার শপথ।

আল্লাহর সাথেযে ওয়াদা করছি তা কার্যকর করলেই আমাদের শান্তি আসতে পারে, অন্যথায় নয়। কিন্তু আমরা তা করি না।

আযান কি?

এবার আসুন আমরা আযানে কি বলি?

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" - "আল্লাহ মহান, আল্লাহ্ মহান"
এই কালেমা বলে মুয়াজ্জিন মসজিদের আশপাশের লোকদেরকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েমের পরিকল্পনা নেয়ার জন্যই মসজিদে হাজির হবার জন্য ডাকছেন।

দ্বিতীয় কালেমা উচ্চারণ করেন- "আশ্হাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" –"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।" অর্থাৎ বাতিলের উলুহিয়াত দূর করলেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম হতে পারে। যেমন- জমিনের আগাছা পরগাছ নির্মূল করলেই জমিনে ফসল হতে পারে। শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই নিমূল হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে নির্মূল করেছিলেন সে পন্থা অনুসণ করতে হবে। এজন্য রাসূল (সাঃ) কে নেতা হিসাবে মানতে হবে। এ কারণে সেই কালেমাটাও আযানে আমরা উচ্চারণ করি।

তৃতীয় কালেমা "আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুলল্লাহ' অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। মুয়াজ্জিন একাই শুধু এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন না, আমরাও তাঁর সাথে সাথে সাক্ষী দিচ্ছি এবং উচ্চারণ করছি। আর মুহাম্মদ (সাঃ) কে নেতা হিসাবে মানতেই হবে, তা না হলে ঈমান থাকবে না। রাসূলকে মানলেই আমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় রাসুলের (সাঃ) আদর্শ মোতাবেক চলা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করা।

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা হাশরঃ ৭)

উপরোক্ত কাজগুলো কিভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায় অর্থাৎ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করা এবং বাতিল ব্যবস্থা সমাজ থেকে নির্মূল করা, রাসূল (সাঃ) কে স্বীকার করে তাঁর আদর্শকে জমিনে কায়েম করা কিভাবে সম্ভব?

পরবর্তী বাক্যের উপর আমল করলেই এইসব দায়িত্ব পালন সম্ভবপর হতে পারে, আর তা হচ্ছে- 'হাইয়া আলা সালাত' অর্থাৎ 'সালাতের দিকে আসুন'।

সালাত কায়েমের মাধ্যমেই তা সমাধা হতে পারে।

এরপরই আরেকটি কালেমা 'হাইয়া আলাল ফালা' অর্থাৎ 'সামাজের কল্যাণ কি করে হতে পারে, তার জন্য আসুন মসজিদে এসবের সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করি'।

এরপরই আবার আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা শুনাই 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' এই জমিনের আগাছা নির্মূলের ঘোষণা দেই তা হচ্ছে এই যে,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অর্থাৎ 'কোনই ইলাহ নেই, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত'।

এই যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দৈনিক ১৭৮ বার উচ্চারণ করি, কিন্তু আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করার কোন চেষ্টাই করি না। হাত না নাড়লে একটা খড় কুটাওতো নড়ে না। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েমের চেষ্টা না করলে কি করে শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম হবে? যেমন পিপাসা লাগলে পানি পান না করে শুধু পানি পানি বললে যেমন পিপাসা নিবারণ হতে পারে না। শীত লাগলে লেপ- তোষক, লেপ-তোষক মুখে উচ্চারণ করলে শীত নিবারণ হতে পারে না। পানি পান করলে পিপাসা নিবারণ হতে পারে আর লেপ- তোষক ব্যবহার করলেই শীত নিবারণ হতে পারে। তেমনি আযান দিয়ে লোক জমা করে সালাত পড়ে, কতকগুলো ওয়াদা মুখে মুখে উচ্চারণ করলেই আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম, আর আল্লাহর অনুহত বান্দ হয়ে গেলাম,

এরূপ ধারণা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কাজেই সালাত বরবাদ হওয়ার যে ব্যাখ্যাগুলো আলোচনা করলাম, দলিল প্রমাণ সহকাবে একবার গভীর ভাবে চিন্তা করার জন্য সালাত আদায়কারী ভাইদের প্রতি অনুরোধ রইলো।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর সালাতের সময় তিনি সিজদায় গেলে আবু জেহেল উটের নাড়ি ভুড়ি কেন মাথার উপর রাখতো? কেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ঘাড়ে পা দিয়ে চেপে ধরতো। কেন সালাতের সময় মুশরিকগণ ভিড় জমাতো। এর কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাতে কোরআনের যেসব আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তাদের শরীরে তা তীরের মতো বিঁধতো। তাদের মধ্যে ক্রিয়া করতো। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনই ক্রিয়া করে না কেন? এর কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা কোরআন থেকে কিছু নিতে রাজী নেই। শুধু মন্ত্রের মতোই তিলাওয়াত করে যাচ্ছি। আমাদের এরূপ সালাতের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ পাক সূরায়ে মাউন এর ৪নং ৫নং আয়াতে "অতঃপর ধ্বংস সেই সব সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা নিজেদের সালাতের প্রতি উদাসীন এবং অমনযোগী।"

যদি 'আন সালাতীহিম সাহুন' না বলে 'ফি সালাতীহিম সাহুন' বলতেন তাহলে ধরে নিতে পারতাম যে হয়তো সালাতে ভুলভ্রান্তির কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে তা নয়। এখানে বলেছেন 'আন সালাতীহিম' সালাতের ব্যাপারে গাফিল, এখন চিন্তা করুন।

পুনরায় সালাতের ক্রিয়া সম্পর্কে আসা যাক। এই সালাত কাফেরদের মধ্যে কিরূপ ক্রিয়া করতো তার একটি ঘটনা, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এখানে পেশ করছি।

একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাকামে ইবরাহীমে সালাত আদায় করছিলেন। সালাতে সূর আলাক তিলাওয়াত করছিলেন। প্রথম ৫টি আয়াত পূর্বেই নাযিল হয়েছিল, বাকী অংশ আবু জেহেল সম্পর্কে নাযিল হয়। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তিলাওয়াত করতে করতেঃ

"তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে, যে আল্লাহর এক বান্দাহ যখন সালাত পড়তে থাকে, নিষেধ করে। তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যদি সেই (বান্দাহ) সঠিক পথে থাকে কিংবা পবিত্রতা ও তাকওয়ার শিক্ষা দেয় (তবে কি তার বিরোধিতা করা সমীচীন?)যদি এই (নিষেধকারী) ব্যক্তি সত্যকে অমান্য করে ও মুখ ফিরায়ে নেয়? সে কি জানে না যে আল্লাহ (এই সব) দেখছেন? কখনোই নয় যদি সে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার মাথার সামনে চুল ধরে তাকে টানবো, সেই লোকটি মিথ্যুক অপরাধকারী পাপিষ্ঠ।"

এ আয়াত তিলাওয়াতের সময় আবু জেহেল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল আর শুনছিল। তখন আবু জেহেলের হৃদয় কম্পন শুরু হলো আর মুহাম্মাদ (সাঃ)- কে ধমকাতে লাগলো।

হে মুহাম্মদ (সাঃ) আমি কি তোমাকে এই কাজ (সালাত আদায়) করতে মানা করিনি? এর সাথে সাথে কড়া ভাষায় ঐ হতভাগা ধমকাতে লাগলো এবং অত্যন্ত কড়া ভাষা প্রয়োগ করলো আর বললো, হে মুহাম্মদ, তুমি কোন বলে বলিয়ান হয়ে আমাকে ধমকাচ্ছো? তুমি কি জান না এই উপত্যকায় আমার দলই সবচেয়ে ভারী, তারা ব্যাপকভাবে আমার ডাকে সাড়া দেয়, তাদেরকে কি আমি ডাকবো? ঠিক ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হয়-

"ঠিক আছে সে ডাকুক তার দলীয় লোকদেরকে, আর আমিও (মহান আল্লাহ) শীঘ্রই ডাকবো জাহান্নামের জাবানিয়াহকে অর্থাৎ জাহান্নামের ফেরেশতাদেরকে।" একথা শুনে আবু জেহেল দৌড়ে পালিয়ে গেল।"

ওমর ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পূর্বের। তিনি মুসলমান হবার পর বর্ণনা করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আপনি একদিন সালাতে সূরা আল-হাক্কাহ তিলাওয়াত করছিলেন। আমি আয়াত গুলোর বিশুদ্ধতা এবং মিল দেখে মনে মনে বলতে লাগলাম, মুহাম্মদ এতো সুন্দর কথা কোথা হতে বলে? সম্ভবতঃ রাত্রে জিন এসে বলে যায় আর দিনে মুহাম্মদ (সাঃ) এসব উচ্চারণ করে। তখনই আপনি বলে উঠলেন- *"নিশ্চয়ই ইহা সম্মানীত রাসূলের কথা"*। পরক্ষণেই আমি মনে

মনে কল্পনা করলাম, মুহাম্মদ যে কথা গুলো বলছে, যেন সে কবি হয়েছে। তৎক্ষণাৎ আপনি তিলাওয়াত করলেন- *"আর উহা কবির কোন কালামও নয়, তোমরা কমই বিশ্বাস করে থাক।"*

একথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, মুহাম্মদ দেখা যায় গণক বা নজ্জুম বা অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে গেছেন দেখছি। তা না হলে সে আমার মনের কথা কি করে বললো? তখনি আপনি বলে উঠলেন- *"আর ইহা কোন নজ্জুমের কথা নয়, তোমরা কমই অনুধাবন করে থাক। একথা শুনার সাথে সাথেই আমার মনে প্রতিক্রিয়া করে বসলো, আমি তক্ষণই দৌড়ে স্থান ত্যাগ করলাম।"*

কিন্তু আফসোস! আমরা এই কোরআন সালাতে তেলাওয়াত করে যাচ্ছি, আর আমাদের মধ্যে কোনই ক্রিয়া করে না। এর কারণ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, এই কোরআন আমরা বুঝতে চাই না, আর এই জমিনে প্রতিষ্ঠাও করতে চাই না।

আবু জেহেল এবং হযরত ওমরের (রাঃ) মনে প্রতিক্রিয়া করে বসলো অর্থ জানার কারণেই তো।

সালাতে কোরআন তেলাওয়াত সালাত আদায়কারীদের সতর্ককারী নয় কি?

ইরশাদ হচ্ছেঃ

"পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে সতর্ককারী হয়।" (আল ফোরকানঃ ১)

"এটা বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ মাত্র।"(সূরা ছোয়াদঃ ৮৭)

"তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অভিপ্রায়ের বাহিরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারনা।"(আত-তাকবীরঃ ২৯)

"আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" (সূরা তোয়াহার ১৪নং)

"কখনই নয়, আপনি তাদের আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজ্‌দা করুন আমার নৈকট্য অর্জন করুন।" [সিজদা](সূরা আলাকের ১৯)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ *"অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যখন কেউ সালাত পড়ে তখন সে তার রবের সাথে কথা বলে।"*

সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃ *"বান্দা যখন সেজদায় থাকে তখন সে তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।"*

উপরোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা আমরা জানতে পারলাম আল্লাহর সাথে কথাপোকথন, আল্লাহর নৈকট্য লাভ, আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর সান্নিধ্য এ কয়টি ব্যতীত আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হওয়া যায় না?

সহীহ বুখারীতে রয়েছে নবী (সাঃ) বলেছেনঃ *"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ঈমানকে সতেজ কর। শুধু মুখে মুখে মন্ত্রের মতো জপ করলেই চলবে না যাবতীয় হুকুম পালন করতে হবে।"*

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একখানা হাদীসঃ *"মুমিন হওয়ার আকাংখা করা আর মুমিনের মতো অবয়ব বানিয়ে নিলেই ঈমান সৃষ্টি হয় না। বরং ঈমান সেই সুদৃঢ় আকীদা যা হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপেই বদ্ধমূল হয়ে যায় আর যাবতীয় কাজ তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।"*

আল্লাহর যাবতীয় হুকুম, আল্লাহর বিধানাবলী মানতে হলে জানা যে কত জরুরী তা বুঝতে বেশী কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কারণ আল্লাহর আইন না জানলে আমল করবো কিরুপে? সালাতই এই প্রয়োজন পূরণ করে। সালাতের মধ্যে কোরআন শরীফের আয়াত পড়ার বিধান এজন্যই ফরজ করা হয়েছে। একথাই কোরআনের উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না?"(সূরা আল আম্বিয়ায়ঃ ১০)

এই আয়াতগুলোর সাহায্য দিন রাত আল্লাহর হুকুম আহকাম সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি। জুমুয়ার সালাতের পূর্বে খোৎবার বিধান এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। এর দ্বারাই আমরা ইসলামের বিধানাবলী জানতে পারি।

জুমুয়ার সালাত এবং জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করার আরেকটি উপকারিতা হচ্ছে এই যে, এই উদ্দেশ্যে আলেম এবং যারা আলেম নন সবাই একত্রিত হয় এবং সকলের পক্ষেই আল্লাহর বিধানসমূহ জানবার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা সত্বেও সালাতে আমাদের প্রতি যেসব নির্দেশ রয়েছে, খোৎবার মাধ্যমে খতীব সাহেব তা মুসল্লীদেরকে বুঝান না। জামায়াতের সাথে সালাত পড়ার জন্য একত্রিত হওয়া সত্বেও অশিক্ষিত সালাত আদায়কারীদেরকে সালাতে কি ওয়াদা করা হলো তার কিছুই জানান না। আর অশিক্ষিত সালাত আদায়কারীরাও আলেমদের কাছ থেকে কিছুই জানবার চেষ্টা করেন না।

সালাতের মাধ্যমে এই সুযোগ পাওয়া সত্বেও আমরা তা কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি না, এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

একথা সকলেই জানা যে একদিকে রয়েছে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ আর আপরদিকে রয়েছে আল্লাহদ্রোহী শক্তি। আল্লাহদ্রোহীরা শয়তানী এবং তাগুতী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা দুনিয়াকে গ্রাস করে যাচ্ছে। অপরদিকে আল্লাহর অনুগত বান্দারা শুধু মুখে মুখে আল্লাহর আনুগত্য করে যাচ্ছে, এসব ইবাদত লোক দেখানো আনুগত্য ছাড়া আর কি হতে পারে? আর লোক দেখানো আনুগত্যের পরিণাম সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

"যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত পড়লো সে শিরক করলো।"

কাজেই আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উপর এমন একটি ইবাদত ফরজ করে দিয়েছেন যাতে করে একটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, ঐক্যবদ্ধ রাখা যায় এবং এই ইবাদতের উপর আমল করলে প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে পারে এই জাতি।

এই ইবাদত পালন করার জন্য প্রত্যেক জামায়াতের একজন নেতা বা পরিচালক হবেন যিনি নিজে শরীয়তের হুকুম মেনে চলবেন এবং গোটা সমাজকে শরীয়তের উপর পরিচালনা করবেন। শরীয়তের ব্যবস্থা তাঁর জামায়াতে কায়েম রাখবেন।

মুসল্লিদেরকে একটি সুসংগঠিত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর মতো হতে হবে, আর ইমাম হবেন সেনাধ্যক্ষ। তিনি যখনই লোকদেরকে চলতে হুকুম করবেন তখন তারা চলতে শুরু করবে, আর যখনই থামতে বলবেন তখনই থেমে যাবে। সালাত ঠিক এমনি ধরনেরই শৃংখলা এবং আনুগত্যের পাকাপোক্ত মেজাজ মানসিকতা তৈরী করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

"আপনি বলে দিনঃ আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় মুখমন্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃজিত হবে।" (সূরাঃ আরাফঃ ২৯)

এর একটা অর্থ এও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায় এবং কাজে স্বীয় মুখমন্ডলকে প্রতিপালকের নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক সেদিক যেন না হয়, এটা শুধু সালাতের ব্যাপারেই নয় বরং যাবতীয় ইবাদত, লেনদেন ইত্যাদির ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

শুধু তেলাওয়াত করলেই কোরআনের মাকসাদ পুরা হতে পারে না। কোরআনের মাকসাদ হাসিল করতে হলে আল্লাহর এই আয়াতের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য নছীহত গ্রহণ করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ
"এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার উপর বরকত হিসেবে নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।"(সূরা ছোয়াদঃ ২৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ
"আর যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ্য আচরণ করে না।"(সূরা ফুরকানঃ ৭৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ
"এমনিভাবে এই কিতাব আমি নাযিল করেছি, ইহা এক বরকতপূর্ণ কিতাব। অতএব তোমরা ইহা অনুসরণ করে চল এবং তাকওয়াপূর্ণ নীতি, আচরণ গ্রহণ কর। হয়তো তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করা হবে।" (সূরা নাহ্‌ল)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ
"প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।"(সূরা নাহলঃ ৪৪)

আল্লাহর বানীঃ
"আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি- যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন- পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশ তাঁরই পথের দিকে।"(সূরা ইবরাহীমঃ ১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেনঃ
"এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই-একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।"(সূরা ইবরাহীমঃ ৫২)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ
"আমি আপনার প্রতি এ জন্যই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্য তাদের কে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং ঈমানদারকে ক্ষমা করার জন্য।"(সূরা নাহলঃ ৬৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ
"আমি এই কোরআন নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।"(সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৪১)

আল্লাহ বানীঃ
"সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মুমিনদেরকে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে- তাদেরকে সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে।"(সূরা কাহাফঃ ১-২)

আল্লাহর বানীতে আরো বলেছেনঃ
"আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি এই কোরআন নাযিল করিনি। তাদের উপদেশ দেয়ার জন্য যারা ভয় করে।"(সূরা ত্ব-হাঃ ২)

আল্লাহ তা'আলা সূরা মারিয়মে ৯৭নং আয়াতে বলেছেনঃ
"আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহেযগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন"

যে ব্যক্তি ইলম ব্যতীত কোরআনের ব্যাপারে কিছু বলে সে তা ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ, ইতকান, ২য় খন্ড-১৭৯ পৃ. হাওয়ালা মায়ারেফুল জিলদে আউয়াল, পৃষ্ঠা-৩৭)

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ বেশী বেশী তেলাওয়াতকে একটা ভারী ছাওয়াবের অধিকারী বলে মনে করে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে কোরআন খতম করে কিন্তু তাদের খবর নেই যে, তারা কি পড়ছে। আর কোরআন নাযিল উদ্দেশ্য কি? অধিকাংশ সময় এক রাত্রে ৩০ পারা কোরআন খতম শেষ করে। রমজান মাসে তারাবীহর সালাতের এত দ্রুত তেলাওয়াত করে শুধু (ই'য়ালামুওন) আর (তা'লামুওন) ব্যতীত কিছুই বুঝা যায় না। যেখানে লিইয়াদাব্বারাও আইয়াতিহী) আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার নির্দেশের ঠাট্টা (উপহাস- মাযাক) করা হয়। সাহাবায়ে কেরামের একেকটি সূরা পড়তে কয়েক বছর লেগে যেতো।

আজ দুনিয়াতে সুসজ্জিত করার জন্য হাজারো যত্ন করা হয়, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য অঢেল টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু কোরআন শিক্ষার জন্য, বঝার জন্য খুব কমই আগ্রহ দেখা যায়। আখেরাতের ভালাই পাওয়ার জন্য সহজ দ্বীনদারী গ্রহণ করা হয় অথচ কোরআন আমাদের কাছে এতই অপাংতেয় এবং এতই জুলুমের বস্তুতে পরিণত হয়েছে যে কোরআনের সাথে আমরা কিরুপ ব্যবহার করে থাকি, কবি মাহেরুল কাদেরীর ভাষায় কোরআনের ফরিয়াদঃ

আমাকে তাকের উপর সাজিয়ে রাখা হয়, চোখে লাগিয়ে কপালে লাগিয়ে সম্মান করা হয়। আমাকে লিখে তাবীজ দেয়া হয়, ধুয়ে ধুয়ে রোগীদেরকে পানি পান করানো হয়। মুখে মুখে মুখস্থ করানো হয়। খুশবো লাগিয়ে আমাকে সম্মান করা হয়, যখন তর্ক বিতর্কে কসমের সময় আমার প্রয়োজন হয়, তখন হাতে উঠায়ে শপথ করা হয়। এ আচরণ পরিবর্তন প্রয়োজন। তোতা পাখি এবং ময়না পাখিকে যেভাবে বুলি শেখানো হয় তেমনিভাবে আমাকেও বুলি হিসাবে শেখানো হয়। এসব অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াত ও তার সাথে সাথে কোরআনের আয়াতে আল্লাহ কি নির্দেশ দিলেন তাও জানতে হবে এবং মানতে হবে।

হযরত যিয়াদ ইবনে লবীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন কিছু আলোচনা করছিলেন। আর তাহলো এইঃ *"দুনিয়া হতে ইলম উঠে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিভাবে ইলম উঠে যাবে? অথচ আমরা তো কোরআন পড়ি। আর আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন পড়াই আর আমাদের সন্তানরা তাদের সন্ত ানদেরকে কোরআন পড়াবে। (এই ভাবে কোরআন পড়ার চর্চা চালু থাকবে)*
তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে গর্ভধারণ না করলেই ভাল হতো। আমি তো তোমাকে মদীনার সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মনে করতাম। (তুমি কি দেখছো না) এই যে ইহুদী এবং নাসারাগন তাওরাত এবং ইঞ্জল পড়ে অথচ তাওরাত এবং ইঞ্জিলে যা কিছু নির্দেশ রয়েছে সে অনুযায়ী আমল করে না।" (ইবনে মাজা)

এই হাদীস হতে আমরা কি বুঝলাম? আমরা সালাতে যা কিছু তেলাওয়াত করি তার অর্থ না জানলে আমল করবো কি করে? শুধু শুধু কোরআন পড়লে আর পড়ালেই কি কোরআনের হক আদায় হবে?

সালাতে কাংখিত ফল পাওয়া যায় না কেন?

"নিশ্চয় সালাত সালাত আদায়কারীদেরকে অশ্লীলতা ও অবৈধ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

সালাত গোটা দ্বীন ইসলামের মূল ভিক্তি। সালাতে অন্যান্য যেসব উপকারিতার কথা বলা হয়েছে সেগুলো বাস্তবে পাওয়া যায় না, যার কারণ সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশ্ব নন্দিত ইসলামের সিপাহসালার, আওলাদে রাসূর, ইসলামের উপর সঠিক গবেষণা ও নির্ভুল ইসলামী আদর্শের অগ্রপথিক আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) যে কথাটি বলেছেন তা আমি হুবহু তুলে ধরলামঃ বর্তমান যুগে সালাত পড়ার পরেও মুসলমান এত লাঞ্ছিত অবহেলিত ও দুর্বল কেন, তাদের চরিত্র উন্নত ও পরিচ্ছন্ন নয় কেন। আল্লাহ একটি অপরাজেয় শক্তিশালী সেনাবাহিনী হয়েও কাফের শত্রুর মুকাবিলায় এত শক্তিহীন ও দুর্বল কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর এরুপ হতে পারে যে, মুসলমানগণ মূলতঃ সালাত আদায় করে না। আর আদায় করলেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মুতাবেক আদায় করে না। সুতরাং সালাত মুসলমান দেহে এবং ব্যক্তি দেহে এবং মনে সংগত কারণেই উন্নতি ও প্রগতির পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে। একথাটি উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বলা যায় যে, আমাদের নিত্য দিনের ব্যবহৃত দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালে দেখি ঘড়িটির ভেতরে রয়েছে অনেক যন্ত্রাংশ। যন্ত্রাংশগুলো একটির সাথে অপরটি জড়িত। চাবি বা ব্যাটারী চার্জ করলে যন্ত্রাংশগুলো সক্রিয় হয়ে নিজ নিজ কাজ শুরু করে এবং সেই সাথে বাইরের কাঁটা ভেতরের যন্ত্রাংশগুলোর কাজের ফল প্রকাশ করে। অর্থা দুটো কাঁটা ঘুরে ঘুরে সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টায় পর ঘন্টা বানাতে থাকে।

আমরা জানি ঘড়ি বানাবার মূল উদ্দেশ্য হলো সঠিক সময় জ্ঞাত হওয়া মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে ঘড়ির ভেতরে ছোট ছোট কতগুলো যন্ত্র একত্রিত করে একটির সাথে আরেকটি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে জুড়ে দেয়া হয়েছে। বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করার কারণে প্রতিটি যন্ত্র লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যতটুকু কাজ করা দরকার ততোটুকু কাজ করে, কমও নয় বেশীও নয়। পুনরায় চাবি দেয়ার কিংবা ব্যাটারী চার্জ করার নিয়মও রয়েছে। এভাবে ঘড়ির ভেতরের যন্ত্রাংশগুলো গতিশীল ও চলমান রাখতে হয়।

ভেতরের যন্ত্রাংশ নিয়মানুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে জুড়ে দেয়ার পর চাবি দিলে কিংবা ব্যাটারী চার্জ করলে তবেই ঘড়ি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। কিন্তু যদি চাবি ঠিকমত দেয়া না হয় কিংবা ভেতরের কোন যন্ত্রাংশ বের করা হয় অথবা অন্য কোন যন্ত্রাংশ ভিতরে জুড়ে দেয়া হয় তাহলে শত সহস্র বার চাবি দিলেও তাতে কোন ফল হবে না।

বাহ্যতঃ এটা একটা ঘড়ি, সব যন্ত্রাংশ এর ভিতরে রয়েছে। ভিতরের যন্ত্রগুলো পদ্ধতিগতভাবে না সাজানোর কারণে কিংবা কোন একটি যন্ত্রাংশ বিকল হওয়া অথবা অন্য যন্ত্র ভিতরে ঢুকে পড়ার ঘড়িটি দ্বারা কাংখিত ফল না পাওয়া গেলেও মানুষ এটিকে একটি ঘড়িই মনে করবে। আপাত দৃষ্টিতে ঘড়ি মনে হলেও এর দ্বারা আসল ঘড়ির কাজ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

ইসলামকে ঘড়ির সাথে তুলনা করে বলা যায়, ঘড়িরর উদ্দেশ্য যেমন সঠিক সময় জ্ঞাত হওয়া, তেমনি ইসলামের উদ্দেশ্য মানুষ আল্লাহর খলীফা হিসাবে দুনিয়াতে বসবাস করবে, আল্লাহর হুকুমানুসারে নিজেরা চলবে, অন্যদেরকেও আল্লাহর বিধানের অধীন পরিচালিত করবে।

এ সম্পর্কিত নির্দেশসূচক আয়াতগুলো হলো এইঃ

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের হিদায়েত ও সংস্কার বিধানের জন্য (দুনিয়ার) কর্ম ক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপের কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখ আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।"(সূরা আলে ইমরানঃ ১১০)

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুনাময়।" (সূরা আল বাকারাহঃ ১৪৩)

"উম্মতে ওয়াসাত" বা মধ্যমপন্থী বা মধ্যম মর্যাদাসম্পন্ন জাতির অর্থঃ এমন একটা সুউচ্চ আদর্শধারী মর্যাদাসম্পন্ন দল যারা ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও অতিশয্যমুক্ত মধ্যমপন্থার অনুসারী হবে। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যমণি বা নেতৃত্বের মর্যাদার অধিষ্ঠিত থাকবে। সকলের সাথে যাদের সম্বন্ধ হবে ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারুর সাথে অন্যায় ও অনুচিৎ ব্যবহার তারা করবে না। (তাফহীমুল কুরআন ৪৪ নং টীকা)

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসককর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়- ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।" (সূরা নূরঃ ৫৫)

কুরআনে এ জাতীয় অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা অনুসরণে একটা সুসভ্য জাতি গড়ে তোলার জন্য সহায়ক হয়। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে ঘড়ির যন্ত্রাংশের ন্যায় ইসলামের অনেক কল কব্জা রয়েছে। ইসলামের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সেসব কল কব্জা যেমন দরকারী, তেমনি পারস্পারিক সম্পূরক। ইসলামের মৌলিক অনেক মতবাদ আকায়েদ, নৈতিক চরিত্রের নিয়মাবলী, কাজ কারবার, আদান প্রদানের কায়েদা কানুন, আল্লাহর হক মানুষের হক, নিজের হক আর দুনিয়ার অন্য যেসব জিনিসের সাথে মানুষের সম্পর্ক রয়েছে সেগুলোর হক, কামাই রোজগার, খরচ করার রীতিনীতি, যুদ্ধ জিহাদের নিয়মপন্থা, সন্ধি সমঝোতার নিয়মাবলী, রাষ্ট্র পরিচালনার বিধানাবলী, এসব কিছুই ইসলামের অংগ। ঘড়ির যন্ত্রাংশের ন্যায় অংশগুলো একটির সাথে অন্যটি এমনভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, চাবি বা ব্যাটারী চার্জ করলেই অংশগুলো সক্রিয় হয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করে আসল উদ্দেশ্য ইসলামের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। সালাতকে "মিফাতাহুল জান্নাহ" অর্থাৎ বেহেশতের চাবি বলার তাৎপর্য এটাই।

বর্তমানে ইসলামের অবস্থা বিকল যন্ত্রাংশ সংযোজিত ঘড়ির মতই। প্রথমতঃ যে জামায়াত গঠনের উদ্দেশ্যে ইসলামের সমস্ত অংশ পরস্পর জুড়ে দেয়া হয়েছিল সেই জামায়াত বা সংঘবদ্ধতার অস্তিত্ব এখন আর নেই। ফলে সব অংশগুলোই আলাদা হয়ে গেছে। ঐক্য শক্তি বিলপ্ত হয়েছে, যার যার ইচ্ছামত কাজ করে চলছে। বাধা দেয়ার কেউ নেই। ইচ্ছা হলে ইসলামের আইন মেনে চলে, অন্যথায় মনগড়া মত চলে। (ধর্ম নিরপেক্ষবাদী, গণতন্ত্র, কমিউজিম ও পুঁজিবাদীর অনুসারীগণ)।

শুধু তাই নয়, ইসলামের মধ্যে এমন সব মনগড়া অংগ জুড়ে দেয়া হচ্ছে যেগুলো কোনক্রমেই ইসলাসের অংগ হতে পারে না। মুসলমানদের আজকের পরিচিতি হলো একদিকে মুসলমান অন্যদিকে সুদী কারবারী, কালোবাজারী, ইংরেজদের আইনের ভিত্তিতে গড়া আদালতে মিথ্যা মুকাদ্দামা দায়েরকারী। আজকে তারা কাফেরদের অনুগত হয়ে তাদের খেদমত করছে। নিজেদের মেয়ে, বোন ও স্ত্রীদের মেম বানাচ্ছে। সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা বিবর্জিত জড়বাদী শিক্ষা দিচ্ছে। রাষ্ট্র পরিচালনায়, অর্থনীতিতে মার্কস, লেনিন, তথা ইউরোপ আমেরিকার অনুসরণ করছে। এতোসব অযাচিত ও অবাঞ্ছিত কাজ করার পরও যদি মনে করা হয় যে, চাবি দিলেই চট করে তালা খুলে যাবে আর কাংখিত ফল আল্লাহর খেলাফত ও প্রভুত্ব নিমিষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তাহলে এরুপ মনে করাকে বোকামী ও আহাম্মকী ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে।

মসলমানদের সালাত, রোজা, হজ্জ, যাকাত সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হওয়ার এটাই কারণ। নিয়মিত সঠিক পদ্ধতিতে সালাত আদায়কারীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। একতা, সততা, সংঘবদ্ধতা শৃংখলা চূর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে আজকের মসলমান লাগাম ছাড়া হয়ে গেছে। ছন্নছাড়া একজন ভব ঘুরে দিয়ে কাংখিত ফল পাওয়ার আশা যেমন বাতুলতা, তেমনি আজকের বল্গাহীন, স্বেচ্চাচার মুসলিমের সালাত নামীয় বিধান দিয়ে ঘোষিত ও কাংকিত ফল পাওয়া সুদূর পরাহত, এ অবস্থা থেকে আমাদেরকে বের হতেই হবে।